জুলাই-আগস্ট উনিশ শ' বিরাশি এক টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

সম্মোহন

মহাকাশগবেষণা

রসায়নবিদ দা ভিঞ্চি

অরণ্যের কথা

এ্যালার্জি

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী। পশ্চিমবঙ্গ বি[illegible] সংস্থা [illegible]

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

জুলাই-আগস্ট, 1982

সম্পাদকীয়		1
ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মোহন	—সৌমেন গুহ	1
ভারতে মহাকাশগবেষণা কি জনস্বার্থবিরোধী?	—সুব্রত চট্টোপাধ্যায়	4
রসায়নবিদ লিওনার্দো দা ভিন্সি	—সঞ্জয়কুমার ভট্টাচার্য্য ও রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	8
অরণ্যের কথা	—অভিজিৎ লাহিড়ী	10
জানবার কথা : এ্যালার্জি	—টি. আহমেদ	13
রিপোর্ট		15
চিঠিপত্র		16

প্রচ্ছদ : রবীন চক্রবর্তী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী লেখা চায়

বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োগ, বিজ্ঞানকর্মীদের সমস কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রচন সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে আহ্বান করা হচ্ছে। কাগজে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অনধিক 2000 শব্দের ম লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কলকাতার বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের লেখা পেত আমরা বিশেষভাবে আগ্রহী। লেখকের না ও ঠিকানার স্পট উল্লেখ অবশ্যই থাকা চাই। রেফার লেখকের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, প্রকাশক, প্রকাশনার স্থান সময়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে লেখকের নাম, ঠিকানা ও ডাক-টিকিট সহ খাম থাক বাঞ্ছনীয়।

যোগাযোগের ঠিকানা : c/o ডি. এস. এন্টারপ্রাইজ,
52/9C বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-12
(প্রতি সোমবার সন্ধ্যায়)

গ্রাহক চাঁদা : বার্ষিক 5 টাকা।
স্টলের কমিশন (কপি বা তদোর্ধাধিক) 25%
এজেন্টদের কমি : 33%

মানি-অর্ডারে যাঁরা টাকা পাঠাবেন, তাঁদের ফর্মের নীচে ঠিকানা লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রগতি বার্তা

আজগুবি, জনবিরোধী, অভিসন্ধিমূলক খবর নয়, সাধারন মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে এগিয়ে নেওয়ার মত খবর ও বিশ্লেষন, মানুষের পথ চলার সাথী।

বি 6/119 কল্যাণী, নদীয়া।

পড়ুন ও পড়ান

সম্পাদকীয় ঃ

'২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্যে স্বাস্থ্য' বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার এই ঘোষণায় ভারতবর্ষও অন্যতম অংশীদার। আগামী দুই দশকের মধ্যে ভারতবর্ষের মানচিত্র স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এ কথা ভাবলে ভারতবাসী মাত্রই পুলকিত হবেন। এখনও যে দেশ কলেরা, গ্যাসট্রো-এনটেরাইটিস-এর মহামারীর কবলে, এখনও যেখানে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও ফাইলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, যেখানে অগুনতি শিশু অতিশীর্ণতাজনিত রোগের শিকার, সেদেশের যে কোন নাগরিক এ হেন সাধুবাক্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করবেন। কৃত অবস্থাটার দিকেই একবার তাকানো যাক। চরম দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের কবলে অগণিত জনসাধারণ ক্রমেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর নতুন করে ৩০ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে, কালাজ্বরে বিকলাঙ্গ হচ্ছে প্রায় ১০ হাজারের মত লোক। অপুষ্টিজনিত কারণে প্রায় ২ লক্ষ শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৬ কোটি বিকলাঙ্গ লোকের বাস এ দেশে। যেখানে যে চিকিৎসাব্যবস্থাটুকু আছে তা নেহাতই অপ্রতুল এবং শহর-কেন্দ্রিক। শতকরা প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ভাগ লোকের কাছে চিকিৎসা পৌঁছতেই পারেনা। এই দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় জনস্বাস্থ্য একটি বহুল ব্যবহৃত আপ্তবাক্য মাত্র। জনস্বাস্থ্য রক্ষার দিকে যত্নবান হয়ে যে পরিকল্পনা বা কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন, বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় তা অনুপস্থিত। তবে আশার কথা এই যে, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার প্রতিবেদনে গ্রামীন স্বাস্থ্য কর্মসূচীর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এরজন্য হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তথা উপকেন্দ্রের যে সাংগঠনিক কাঠামোর কথা ভাবা হয়েছে তার সার্থক রূপায়নের দাবীর সাথে সাথেই আমরা এই প্রশ্ন করতে পারিনা যে চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈষম্য সমাজের গভীরে নিহিত, তা এইভাবে কি দূর করা যাবে? অর্ধাহারে অনাহারে জর্জরিত দেশের অগণিত মানুষকে কি এর দ্বারা অপুষ্টির হাত থেকে বাঁচানো যাবে? এই ঘোষণার দ্বারা কি অশিক্ষা আর কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙ্গে স্বাস্থ্য সচেতনতার বিকাশ ঘটান সম্ভব হবে? বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে স্বাস্থ্যবান ভবিষ্যৎ নাগরিকদের আশায় আমরা এ প্রশ্ন রাখছি। যেখানে স্বাস্থ্য—সামগ্রী হিসাবে কেনা যায়, সেখানে জনস্বাস্থ্যের সরকারী যন্ত্র কতটা উৎসাহিত হবে, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়েনা। বহুজাতিক সংস্থা থেকে শুরু করে ছোট-বড় পুঁজিপতিদের স্বার্থ-বহন কারী এই চিকিৎসাব্যবস্থার থেকে মুক্ত হ'য়ে সকলের জন্য স্বাস্থ্য পেতে হ'লে যে গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন, তা ব্যতিরেকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নামক মুক্তিদাতার প্রতীক্ষায় থাকা আর এক নিস্ফল প্রয়াস হবে না ত!

যাই হোক, প্রশ্নটা কিন্তু জনস্বাস্থ্য সমস্যাটার মোকাবিলা করার পদ্ধতিটিকে নিয়েই। বিভিন্ন অসুখ থেকে মুক্তি থেকে শুরু করে মানুষের প্রাথমিক খাদ্যের অভাব নিয়ে আলোচনা—এভাবে না এগিয়ে, আমরা শুরু করতে চাইছি ভারতবর্ষের মানুষের প্রাথমিক খাদ্যের অভাব থেকেই। প্রাথমিক খাদ্য, তার সাথে ন্যূনতম আশ্রয়, পরিধেয় বস্ত্র, সুস্থ বাসস্থানের পরিবেশ—এ সমস্যাটুকু থেকে শুরু না করলে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের দিশাটাই যাবে উল্টে। কত খানি চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, এ তর্কটুকু বেড়েউঠবে ন্যূনতম প্রয়োজনের সমস্যা বেড়ে ওঠার সাথে সাথেই। একটা যদি আন্দোলন হতো—দু'হাজার সালের মধ্যে সমস্ত মানুষকে প্রাথমিক খাদ্য যোগান দেওয়ার, বা দু'হাজার সালের মধ্যে প্রাথমিক খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান যোগান দেওয়ার—ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, এমনকি আমাদের কাছেও, মনে হতো, আন্দোলনের দিশাটুকু হারিয়ে যাচ্ছেনা। আর সেইমতো আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া যেতো নিরন্ন মানুষের চিকিৎসাকেন্দ্রের পরিবর্তে, অসংখ্য মানুষের জনবসতি আর ধানক্ষেতের মাঝখানে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের বুকভরা আশা নিয়ে॥

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মোহন

মঞ্চের ওপরে একজন ব্যক্তির সামনে যাদুকর অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, বিশেষ কয়েকটি অঙ্গভঙ্গী করার পরেই, সামনের ব্যক্তিটি ঘুমিয়ে পড়লো, আর তাকে দিয়ে প্রায় যা-খুশি-তাই ভাবানো গেলো বা করানো গেলো। বলা হলো—ব্যক্তিটি সম্মোহিত, যাকে সম্মোহন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ করা হলো 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মোহন করতে

সম্পাদকীয় ঃ

'২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্যে স্বাস্থ্য' বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার এই ঘোষণায় ভারতবর্ষও অন্যতম অংশীদার। আগামী দুই দশকের মধ্যে ভারতবর্ষের মানচিত্র স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এ কথা ভাবলে ভারতবাসী মাত্রই পুলকিত হবেন। এখনও যে দেশ কলেরা, গ্যাসট্রো-এনটেরাইটিস-এর মহামারীর কবলে, এখনও যেখানে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও ফাইলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, যেখানে অগুনতি শিশু অতিশীর্ণতাজনিত রোগের শিকার, সেদেশের যে কোন নাগরিক এ হেন সাধুবাক্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করবেন। কৃত অবস্থাটার দিকেই একবার তাকানো যাক। চরম দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের কবলে অগণিত জনসাধারণ ক্রমেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর নতুন করে ৩০ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে, কালাজ্বরে বিকলাঙ্গ হচ্ছে প্রায় ১০ হাজারের মত লোক। অপুষ্টিজনিত কারণে প্রায় ২ লক্ষ শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৬ কোটি বিকলাঙ্গ লোকের বাস এ দেশে। যেখানে যে চিকিৎসাব্যবস্থাটুকু আছে তা নেহাতই অপ্রতুল এবং শহর-কেন্দ্রিক। শতকরা প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ভাগ লোকের কাছে চিকিৎসা পৌঁছতেই পারেনা। এই দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় জনস্বাস্থ্য একটি বহুল ব্যবহৃত আপ্তবাক্য মাত্র। জনস্বাস্থ্য রক্ষার দিকে যত্নবান হয়ে যে পরিকল্পনা বা কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন, বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় তা অনুপস্থিত। তবে আশার কথা এই যে, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার প্রতিবেদনে গ্রামীন স্বাস্থ্য কর্মসূচীর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এরজন্য হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তথা উপকেন্দ্রের যে সাংগঠনিক কাঠামোর কথা ভাবা হয়েছে তার সার্থক রূপায়নের দাবীর সাথে সাথেই আমরা এই প্রশ্ন করতে পারিনা যে চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈষম্য সমাজের গভীরে নিহিত, তা এইভাবে কি দূর করা যাবে? অর্ধাহারে অনাহারে জর্জরিত দেশের অগণিত মানুষকে কি এর দ্বারা অপুষ্টির হাত থেকে বাঁচানো যাবে? এই ঘোষণার দ্বারা কি অশিক্ষা আর কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙ্গে স্বাস্থ্য সচেতনতার বিকাশ ঘটান সম্ভব হবে? বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে স্বাস্থ্যবান ভবিষ্যৎ নাগরিকদের আশায় আমরা এ প্রশ্ন রাখছি। যেখানে স্বাস্থ্য—সামগ্রী হিসাবে কেনা যায়, সেখানে জনস্বাস্থ্যের সরকারী যন্ত্র কতটা উৎসাহিত হবে, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়েনা। বহুজাতিক সংস্থা থেকে শুরু করে ছোট-বড় পুঁজিপতিদের স্বার্থ-বহন কারী এই চিকিৎসাব্যবস্থার থেকে মুক্ত হ'য়ে সকলের জন্য স্বাস্থ্য পেতে হ'লে যে গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন, তা ব্যতিরেকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নামক মুক্তিদাতার প্রতীক্ষায় থাকা আর এক নিস্ফল প্রয়াস হবে না ত!

যাই হোক, প্রশ্নটা কিন্তু জনস্বাস্থ্য সমস্যাটার মোকাবিলা করার পদ্ধতিটিকে নিয়েই। বিভিন্ন অসুখ থেকে মুক্তি থেকে শুরু করে মানুষের প্রাথমিক খাদ্যের অভাব নিয়ে আলোচনা—এভাবে না এগিয়ে, আমরা শুরু করতে চাইছি ভারতবর্ষের মানুষের প্রাথমিক খাদ্যের অভাব থেকেই। প্রাথমিক খাদ্য, তার সাথে ন্যূনতম আশ্রয়, পরিধেয় বস্ত্র, সুস্থ বাসস্থানের পরিবেশ—এ সমস্যাটুকু থেকে শুরু না করলে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের দিশাটাই যাবে উল্টে। কত খানি চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, এ তর্কটুকু বেড়েউঠবে ন্যূনতম প্রয়োজনের সমস্যা বেড়ে ওঠার সাথে সাথেই। একটা যদি আন্দোলন হতো—দু'হাজার সালের মধ্যে সমস্ত মানুষকে প্রাথমিক খাদ্য যোগান দেওয়ার, বা দু'হাজার সালের মধ্যে প্রাথমিক খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান যোগান দেওয়ার—ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, এমনকি আমাদের কাছেও, মনে হতো, আন্দোলনের দিশাটুকু হারিয়ে যাচ্ছেনা। আর সেইমতো আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া যেতো নিরন্ন মানুষের চিকিৎসাকেন্দ্রের পরিবর্তে, অসংখ্য মানুষের জনবসতি আর ধানক্ষেতের মাঝখানে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের বুকভরা আশা নিয়ে॥

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মোহন

মঞ্চের ওপরে একজন ব্যক্তির সামনে যাদুকর অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, বিশেষ কয়েকটি অঙ্গভঙ্গী করার পরেই, সামনের ব্যক্তিটি ঘুমিয়ে পড়লো, আর তাকে দিয়ে প্রায় যা-খুশি-তাই ভাবানো গেলো বা করানো গেলো। বলা হলো—ব্যক্তিটি সম্মোহিত, যাকে সম্মোহন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ করা হলো 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মোহন করতে

ঘেয়ে উত্তেজনসৃষ্টির সহায়ক মাত্র। এখানে ইচ্ছা-অনিচ্ছার তেমন দাম নেই।

প্রসঙ্গত—অতি আধুনিক সঙ্গীতে (যদি সঙ্গীত বলি) শব্দ ও কথা ব্যবহার করা হয় নানা ধাপে—টেমপটেশন্, এক্সাইটেশন্, ইন্‌হিবিশন্ ইত্যাদি! ভাবতে পারেন—অসংখ্য তরুণ-তরুণীকে নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা পরিকল্পনামাফিক! আমাদের পূজো-আর্চায় ঘন্টা ও ধূপ-ধুনো কি একই উদ্দেশ্যে?

আমি অসহায়!

ট্রেনে বা বাসে ঝিমুনি লাগার কারণ আর সম্মোহনের কৌশল মূলত এক।

এক রোগীকে দেখা গেল অনেক জিজ্ঞাসার পর তার বাড়ীতে আকস্মিক দুর্ঘটনা দেখে সে চেয়ারে বসে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। তারপর থেকে, বিশেষ মুহূর্তগুলিতে আজো তার হাতটা অবশ লাগে।

নিজের অনিচ্ছায় বা অজান্তেই আমরা নিজেরাই বাধ্য হই স্পষ্ট সম্মোহনের অবস্থা। স্টেশন এলে ঘুম ভাঙে নিখুঁত বা অসাড় হয়ে থাকে হাতটা চিরকাল।

পাভলভ্ লক্ষ্য করেছিলেন এক ধরণের শিজোফ্রেনিয়ায় মানসিক রোগী আসলে আত্ম-সম্মোহিত অবস্থায় থাকে—মস্তিষ্কের কোনো বিশেষ স্নায়বিক ক্ষতিটাকে সামাল দিতে একটা সম্মোহনের অবস্থা নিজের অজান্তেই আসে [2]।

অবসন্ন দেহে ঘুম—এটা একটা সরল মাধ্যম সম্মোহিত করার। ঘুমের মধ্যে সম্মোহিত করার কৌশল বিশেষ পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা নিতে পারে [1]।

আমাদের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমরা সম্মোহনের অবস্থা তৈরী করি—অবিরাম, অনিচ্ছায়, অজান্তে। 'হিপ্নোসিস্' যতক্ষণ বাংলায় 'সম্মোহন'—ততক্ষণ হয়তো এর চরিত্র বুঝতে অসুবিধা হতে পারে।

অপকর্ম সম্মোহন

যদি কেউ আপনার অজান্তে সম্মোহন করে কোনো ইচ্ছা বিরুদ্ধ কাজ করিয়ে নেয়?

আর সেই ভয়টাই এখন বাস্তব।

আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি-আই-এ এখন তাই করছে বলে অজস্র তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে [3]। নানাভাবে তাদের কর্মীদের সম্মোহিত করে বিশেষ কাজ, গোপন সংবাদ বহন থেকে খুন পর্যন্ত করিয়ে নিচ্ছে। কর্মীরা ভুলে যাচ্ছে সজাগ অবস্থায় কে, কখন, কোথায়, কিভাবে, কোন্ নির্দেশ তাকে দিয়েছিলো। সম্প্রতি এই বিষয়ে আলোচনায় ওয়াল্টার বাওয়ার্ট এটা বলেছে—'মন নিয়ন্ত্রন অভিযান' [3]।

এদের অভিযোগে আরো আতঙ্কজনক হলো রাশিয়ার গবেষণা—'প্যারাসাইকোলজি' বা 'সাইবার্নেটিকস্' নামে। রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা কে-জি-বি এর আড়ালে গড়ে তুলেছে এক বৃহৎ মন নিয়ে মারণখেলার উপকরণ। বন্দী বিদ্রোহীরা মানসিক হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে—সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত মনে বেঁচে থাকছে। কবি ভি-আই-চেনিশভ্ কারাগার থেকে গোপনে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে—'আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে আরো খারাপ অত্যাচার—আমার মনে ওরা রাসায়নিক ঢেলে দেবে। ...আমি যদি বেঁচেও থাকি, আমি আর একটাও কবিতা লিখতে পারবো না'। চেনিশভ-ই জানিয়েছেন—রাশিয়ার কারান্তরালে মানুষের ব্যক্তিত্ব ভেঙে দেওয়া হয় 'অ্যামিনাজিন্' রাসায়নিক প্রয়োগে [4]!

ওষুধ অথবা আরো সূক্ষ্ম কোনো মন নিয়ন্ত্রনের বস্তু হয়তো ব্যবহৃত হতে পারে একটা সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে—যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে। সেই ভয় এখন আর অমূলক নয়। ক্ষমতাবান দেশগুলোতে বিজ্ঞান কোমর বেঁধে লেগেছে—সমগ্র জাতিকেই সম্মোহিত করার কৌশল আয়ত্ত করতে। আমেরিকায় মাইক্রোওয়েভে বা ওষুধে সমগ্র জাতির মানসিক বিকলতা আনার উপায় বেরিয়েছে—রাশিয়ায় খুশীমতো মন বানানোর গবেষণা এগিয়ে চলেছে [3]।

এমনি অবস্থায়...

এমনি অবস্থায় পুনর্বার খতিয়ে দেখা যেতে পারে—সম্মোহন অনিচ্ছা বা অজান্তে কেন করা যায়। একজনকে নয়, দলকেও কেন করা যায়। তা হ'লে পূজো-আর্চা, ধূপধুনো, সাধুবাবা শুধু বোঝা নয়—বোঝা যাবে সর্বাধুনিক মানসিক যুদ্ধের বেড়ে ওঠা চক্রান্তকে। আমরা তো চাই সম্মোহন সম্পর্কে মেকী ধারণা দূর হোক॥

নির্দেশিকা :

1. Hypnosis : Facts and Fiction—F. L. Marcuse (Penguin, 1977)
2. Psychopathology and Psychiatry—I. P. Pavlov (FLPH, Moscow)
3. Operation Mind Control—Walter Bowart (Fontana, 1978)
4. KGB—John Barron (Bantam, 1974)

ভারতে মহাকাশ গবেষণা কি জনস্বার্থবিরোধী ?

এক

গতবছর কৃত্রিম উপগ্রহ 'অ্যাপলে'র মাধ্যমে সারা দেশে বিভিন্ন শহরে একইযোগে দূরদর্শনে স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশতম বার্ষিকী অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হলো। আমরা শহরের লোকেরা আনন্দিত হলাম নিজেদের কৃত্রিম উপগ্রহের সাফল্যে। আরো জানলাম অ্যাপলের মাধ্যমে সংবাদপত্র ছাপা হবে এর পরে। মনে মনে ভাবি, চৌত্রিশ বছরে আমাদের দেশ অনেক এগিয়েছে। রাজস্থানে আমরা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি, নিজস্ব রকেটে নিজেদের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছি, এই মুহূর্তে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির সংখ্যার দিক থেকে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীতে তৃতীয়—আমেরিকা ও রাশিয়ার পরই, তা ছাড়া আমরা খাদ্যে স্বয়ংভর···আরো কত কি! কিন্তু একটু পরেই ভাবনাচিন্তা ধাক্কা খায় যখন মুদ্রার অন্যদিকের চিত্রটা দেখি। কি ব্যাপার? ১৯৭১ থেকে ১৯৮১, শুধু এই দশ বছরেই ভারতে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা বেড়েছে পৌনে পাঁচ কোটির বেশী। ১৯৮১-র হিসেব অনুসারেই ভারতে শতকরা ৭৫ভাগ মহিলা এখনো নিরক্ষর। আমরা বাড়ীতে যে বাচ্চা মেয়েটা সকালে-বিকালে কাজ করতে আসে, একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম। ওর বয়স দশ, ও ক্লাস টু পর্যন্ত করপোরেশনের স্কুলে পড়তে যেত, তারপর আর যায় না, বাড়ীতে বাড়ীতে বাসন ধোওয়ার কাজ করে, ওর ইস্কুলে যেতে এখন খুব ইচ্ছে করে। ওর বোনটা ইস্কুলে যাবার আগেই কাজে নেমে গেছে। মাঝে মাঝে ইস্কুলে যাবার বায়না ধরে, তখন মার খায়। চিত্রটা আরো একটু পরিষ্কার হলো যখন জানলাম ভারতবর্ষে ২০ শতাংশ শিশু কোনোদিন ইস্কুলে যেতে পারে না। আমাদের একটি সংবিধান আছে, আছে স্বতন্ত্র আইন মন্ত্রক। সেখানে চৌদ্দ বছরের নীচে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ অথচ পৃথিবীতে সর্বাধিক শিশু শ্রমিক এই ভারতবর্ষে। সংখ্যায় বিশ্বের শিশুশ্রমিকদের এক চতুর্থাংশ এদেশেই। কাগজে-বিজ্ঞাপনে-রেডিওতে সর্বত্র শুনি আমরা সবুজ বিপ্লব করে ফেলেছি, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংভর হয়ে গেছি কত কথা! অথচ ভারতবর্ষের ৯৩ শতাংশ শিশু গড়ে মাত্র ৬৫০ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য পায় যেখানে দৈনিক প্রয়োজন ১৩৫০ ক্যালরি! মুদ্রার অন্যদিকের চিত্র যত চোখের সামনে পরিষ্কার হতে থাকে তত অগ্রগতি, স্বয়ংভরতা, স্বাধীনতা, এইসব কথাগুলো হেঁয়ালী মনে হয়। এবছর বিশ্বপ্রতিবন্ধী বর্ষ, সেজন্য কত সেমিনার, কত আলোচনা, কত পরিকল্পনা হচ্ছে যেমন হয়েছিল আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ কয়েক বছর আগে। এতসব নাকি হচ্ছে অথচ প্রতিবছর ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজার শিশু সামান্য ভিটামিন 'এ'-র অভাবে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে এমনকি এই বিশ্বপ্রতিবন্ধী বর্ষেও তা ব্যতিক্রম হবে না। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের গায়ে সরকারের প্রচার দেখি, 1947—1981 : AN ERA OF ACHIEVEMENTS. সঙ্গতকারণেই মনে প্রশ্ন জাগে কোন্ ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে? এই যে 'শিল্পে অগ্রগতি', 'আর্থনীতিক প্রগতি', 'খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা', 'পরমাণুশক্তিসম্পন্ন দেশ', 'ভারতবর্ষ মহাকাশযুগ' এইসব কথাগুলো কি আমাদের দেশের তক্‌মা? না কি ক্ষত আড়াল করার জন্য প্রলেপ দেওয়া? সমস্যাপীড়িত এই দরিদ্র দেশে মহাকাশ গবেষণা কি জনস্বার্থবিরোধী?

দুই

উত্তরের সন্ধান করার আগে একটু পেছনের দিকে ফেরা যাক্। ভারতবর্ষে মহাকাশগবেষণার বয়স কমবেশী ১৮ বছর। ১৯৬৩ থেকে ১৯৮১। এই ১৮ বছরের মধ্যে আমাদের দেশ কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণে বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছে। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় পরিকল্পনায় তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ অ্যাপলকে ভূসমলয়কক্ষে স্থাপন করে আমাদের মহাকাশবিজ্ঞানীরা বিশ্বে পাঁচটি দেশের পাশে ভারতবর্ষের নামও যুক্ত করেছেন। অনুরূপ কৃতিত্বের অধিকারী দেশগুলির নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী এবং ফ্রান্স। অবশ্য রকেট প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের দেশ বেশ কিছুটা পিছিয়ে আছে। শুরু থেকেই প্রায়, মহাকাশগবেষণার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রতিযোগিতা চলেছিল। রাশিয়া প্রথম মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠালো ১৯৫৭ সালে, আমেরিকা প্রথম সরাসরি চাঁদে মানুষ পাঠালো ১৯৬৯ সালে। দুইদেশই বিজ্ঞানগবেষণার কথা মুখে বললেও দুই বৃহৎ শক্তির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মর্যাদার লড়াই যে প্রধান ছিল তার প্রমাণ মেলে ক্যালটেকের জেট্ প্রপালশন্ ল্যাবের ডিরেক্টার Bruce Murray যখন বলেই ফেলেন, "We did not go to moon for science, national prestige and strategy was our goal". দুজন মানুষকে চাঁদের বুকে পদার্পণ করাতে আমেরিকার খরচ পড়েছিল ২৪০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ১৯২০০ কোটি ভারতীয় টাকা। সুতরাং সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর অর্থনৈতিক সঙ্কটের চাপে এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিবর্তে এই কোটি কোটি ডলারের প্রকল্পের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল এবং জনমতের চাপে আমেরিকার ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্ (নাসা) অ্যাপোলো ১১-র পর আরো নয়টি অ্যাপোলো যান চাঁদে পাঠা-

নোর সিদ্ধান্ত বাতিল করে অ্যাপোলো ১১-র পর আরো পাঁচটি যান পাঠিয়ে অ্যাপোলো প্রকল্পের সমাপ্তি ঘটাল। অ্যাপোলোর অবশিষ্ট যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরী হোল স্কাইল্যাব, কেননা বাজেট কমে গেছে। যাইহোক, স্কাইল্যাবের বিপর্যয়কর পরিণতি ঘটল, পৃথিবীর বুকে মুখ থুবড়ে ভেঙ্গে প'ড়ে। সাম্প্রতিককালে স্পেস শাট্‌ল্ বা ফেরী মহাকাশযান আমেরিকা তৈরী করেছে যার নাম কলাম্বিয়া। মহাকাশযাত্রা করে এটি পৃথিবীতে ফিরে এসে আবার যাত্রা করতে পারে। এখানে লক্ষ্যণীয় আমেরিকার বিজ্ঞানগবেষণার সাফল্যের ইতিহাসে স্কাইল্যাব যে অকৃতিত্বের ছাপ ফেলেছিল, কলাম্বিয়া এবং ভয়েজার এই দুই মহাকাশযানের সাফল্য সামনে তুলে ধরে রেগনশাসিত আমেরিকা সেই অগৌরবকে ম্লান করে দিতে চাইছে। সুতরাং 'ন্যাশনাল প্রেস্টিজ' এর প্রশ্ন এখানেও জড়িত।

কলাম্বিয়ার মাধ্যমে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাতে খরচ হবে ১১ মিলিয়ন ডলার। নাসা গোটা কলাম্বিয়ার ভাড়া ঠিক করেছে ৩০·৯ মিলিয়ন ডলার। অ্যাপোলো-১১র জন্য হয়েছিল ১৯২০০ কোটি টাকা। পরবর্তী আরো পাঁচটি অ্যাপোলো যানের প্রতিটির জন্য খরচ হচ্ছিল ১৪০০০ কোটি টাকার মতন অর্থাৎ পাঁচটির জন্য মোট খরচ প্রায় ৭০-০০০ কোটি টাকা। সুতরাং অ্যাপোলো প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ব্যয় হয়েছিল ৮৯,২০০ কোটি টাকার মতন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যভেদের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে মহাকাশ পরিক্রমার বিরুদ্ধে আদিলগ্নেই সরব হয়েছিলেন সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিকগণ এবং সচেতন বিজ্ঞানীরা। বিখ্যাত কসমোলজিস্ট অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল বোম্বাইতে 'টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ' পরিদর্শনকালে চন্দ্রলোক অভিযান সম্বন্ধে 'criminal waste of money and a useless kind of activity' বলে মন্তব্য করেছিলেন। মার্কিন সরকার যখন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে মহাকাশগবেষণার ক্ষেত্রে এবং একবার বলছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যভেদ করাই উদ্দেশ্য কিন্তু পরক্ষণে হয়ত বলছে জাতীয় মর্যাদা এবং কৌশলই লক্ষ্য, সেই মার্কিন সমাজের চিত্রটা কী রকম? যে মাটিতে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেইখানের সমস্ত সমস্যার সমাধান কি হয়ে গেছে? না তা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কমপক্ষে ১১ শতাংশ মানুষ দরিদ্র (আমেরিকার ও ভারতের দরিদ্র মানুষের মধ্যে যদিও অনেক তফাত)। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জনসনের নিজের হিসাব মতোই আমেরিকায় ন্যূনপক্ষে ৪০ লক্ষ বালক-বালিকা প্রতিদিন প্রায় অনাহারে স্কুলে যায়, প্রত্যেক বছর অন্তত ১০ লক্ষ ছাত্রকে স্কুলের লেখাপড়া ছাড়তে হয় এবং আরো ১০ লক্ষ ছাত্র মস্তিষ্কের ব্যাধি ও মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়। এই যখন চিত্র তখন এই বিপুল অর্থব্যয়কৃত সাফল্যকে উপহাস করে টয়েনবি বলেছিলেন: In a sense going to the moon is like building the pyramid or Louis XIY's palace at Versailles. Sizing up man's achievement, one would say how amazing, how strange, that this creature is so marvellous in his technology, but in morals and social behaviour, he has stayed practically stationary. This makes technology a menace."

তিন

আজকের দিনে শুধু মহাকাশপ্রযুক্তি নয়, বিজ্ঞান গবেষণাই সামাজিক প্রয়োজন ও জনকল্যাণের আদর্শ থেকে যোজন দূরত্বে অবস্থান করছে। বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য, এই আপ্ত-বাক্যে সচেতন বিজ্ঞানীরা আস্থাবান নন। বিজ্ঞানচর্চার সাথে সামাজিক প্রয়োজনের যে সামঞ্জস্য, বিজ্ঞান ও সমাজের গভীর অন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অবগত না থাকলে যুদ্ধবাজ শাসকগোষ্ঠীরা বিজ্ঞানকে কিভাবে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করতে পারে তার চরম নিদর্শন পৃথিবীর বুকে হিরোসিমা-নাগাসাকি-ভিয়েতনাম-ইন্দোচীন। মানবকল্যাণের বদলে সামরিক প্রয়োজনই আজ বিজ্ঞান গবেষণার ভারকেন্দ্র। হপকিনস্, আরিজোনা, ওরিগণ, ক্যালিফোর্ণিয়া ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়নিক ও জৈবিক গবেষণা যে শুধু যুদ্ধের প্রয়োজনের তাগিদে পেন্টাগণের সমরবিদদের পরিকল্পনায় হয়েছিল আজ আর অজানা নয়। চাঁদে যাওয়ার পেছনে বিজ্ঞানচর্চা যে প্রধান কারণ নয় সেটা আমরা জানতে পেরেছি কর্মকর্তাদের মুখেই যদিও অজানাকে জানা, ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যভেদ এসব বারংবার ঘোষণা করা হয়েছিল। Bruce Murray যে স্ট্র্যাটেজির উল্লেখ করেছেন সেটা কিসের স্ট্র্যাটেজি? আজকের দিনেও কলাম্বিয়ার গায়ে বিজ্ঞানের নামাবলী পরালেও ভেতরের চেহারা ধরা পড়ে যাচ্ছে এইসব ঘটনায় যখন শুনি প্রথম দিকে কলাম্বিয়া প্রকল্পকেও মুখ্যত কাজে লাগাবেন 'নাসা' এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর। যে ফেরী মহাকাশযানে করে বৃহস্পতি গ্রহের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করতে একটি মহাকাশযান নিয়ে যাওয়া হবে, বিভিন্ন দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ ভূসমলয়কক্ষে স্থাপন করতে যে ফেরী মহাকাশযানকে ভাড়া দেওয়া হবে, মহাকাশ গবেষণায় তৃতীয় যুগের সূচনাকারী এই স্পেস শাটলের সাথে প্রতিরক্ষার কী সম্পর্ক থাকতে পারে? মার্কিন নৌবাহিনীর সিনকম-৪-২ কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা কি বিজ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য? উত্তর পরিষ্কার। মূল সামরিক উদ্দেশ্য আড়াল করার জন্যই কিংবা অপ্রধান করে দেখানোর জন্যই ঐ সমস্ত আয়োজন-প্রচার ইত্যাদি ইত্যাদি। আর মজার ব্যাপার হলো মহাকাশবিজ্ঞানের

অগ্রগতি, জনকল্যাণ এসবের জন্য মহাকাশে কতগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হতে পারে? নিশ্চয়ই হাজার হাজার নয়। শুনলে অবাক হতে হয় মহাকাশে পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহের সংখ্যা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রায় সাড়ে চার হাজার এবং আমেরিকার দেড় হাজার। সুতরাং স্ট্র্যাটেজি সামরিক।

চার

আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা চাঁদের মাটি নিয়ে পরীক্ষা করছেন এই ভারতের বুকেই, একথা শুনলে চমকে উঠবেন না। আমাদের সাধ আছে চাঁদের মাটি পরীক্ষা করে দেখার যেন ভারতবর্ষের মাটিতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বা হতে চলেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার দয়ায় আমরা চাঁদের মাটির নমুনা পেয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হই। রুশী রকেটের সাহায্যেই প্রথম দুই কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট এবং ভাস্কর মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। সম্প্রতি রুশমহাকাশযানে ভারতীয় নভশ্চর মহাকাশপরিক্রমায় যাবে স্থির হয়েছে। ভাগ্যিস রাশিয়া কৃপা করেছিল, তা না হলে মহাকাশে দেশের মানুষ পাঠানো আমাদের কবে হতো কে জানে! শুধু এই নয়, সোভিয়েট নেতা ব্রেজনেভ দিল্লীর লালকেল্লার প্রাঙ্গণে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর আনুকূল্যে মহাকাশে স্পুটনিক উৎক্ষেপণের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। সমরাস্ত্র বা অর্থনৈতিক বাণিজ্যের কথা বাদ দিলাম কারণ এখানে তা আলোচ্য নয় তবু বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রেও আমরা একটু সোভিয়েট ঘেঁষা হয়ে পড়েছি একথা বলা বাহুল্য।

আমাদের দেশে এযাবৎ মহাকাশকর্মসূচীর পেছনে ব্যয় হয়েছে ৩০০ কোটি টাকারও বেশী। আগামী ১০ বছরে মহাকাশ-গবেষণাবাবদ ব্যয় হবে ৮০০ কোটি টাকা। অ্যাপলকে ভূসমলয় কক্ষে স্থাপন করার পর আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরও একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ভূসমলয় কক্ষে স্থাপন করা হবে। এটির নাম ইনডিয়ান ন্যাশনাল স্যাটেলাইট বা ইনস্যাট-১এ। ইনডিয়ান ন্যাশনাল নাম হলেও এটি আমেরিকার উপগ্রহ, পাঠানো হবে আমেরিকার রকেটে। অর্থাৎ ভারতের কাজ দামটা দিয়ে দেওয়া। দাম কিরকম? আমেরিকার কাছ থেকে উপগ্রহটি ভারত কিনছে ছয় কোটি টাকায় আর ১০০০ কেজি ওজনের উপগ্রহটি মহাকাশে পাঠাতে খরচ হবে আরো এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। এর পরবর্তী পর্যায়ে ইনস্যাট-১-বিকে কলাম্বিয়ার সাহায্যে মহাকাশে পাঠানো হবে যদিও ইনস্যাট-১বি তৈরী হবে ভারতে তবু কলাম্বিয়ার মাধ্যমে পাঠাতে খরচ হবে ১১ মিলিয়ন ডলারের মত।

আমাদের দেশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর সময়ে জনকল্যাণ এবং জনস্বার্থ এই কথাগুলো ব্যবহার করা হয়। যে দে জনগণের কল্যাণে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাচ্ছে মহাকাশে, শি বিস্তারের ক্ষেত্রেই সেই সরকারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকা অন্ততঃ চেষ্টা থাকবে। তাই নয় কি? স্বাস্থ্যবিষয়েও সেই সরকারের প্রচেষ্টা থাকবে মানুষের রোগপ্রতিরোধের ও নিরাময়ের দিকে, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় ঠিকমত করার দিকে। কিন্তু আমাদের দেশে যখন ৭১ শতাংশ লোক নিরক্ষর (১৯৭১-এ) তখন সরকার ১৯৭৪-এ পঞ্চম পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় প্রায় ২৫% কমিয়ে দিচ্ছেন। সরকার বাজেটের ৩% ব্যয় করেন শিক্ষাখাতে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উপেক্ষা করে ঢালাও অর্থব্যয় করা হয় উচ্চশিক্ষাখাতে। উচ্চশিক্ষার বিরোধী আমি নই কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয়-সঙ্কোচ চোখে আঙুল দেখিয়ে দেয় সামান্য শিক্ষার আলোটুকু জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সরকার কতখানি নিশ্চেষ্ট। জনকল্যাণের আরেক নমুনা স্বাস্থ্যবিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী। মুদালিয়র কমিশনের (১৯৬২) অভিমতে যেখানে বাজেটের অন্তত ১০ শতাংশ ব্যয় হওয়া উচিত স্বাস্থ্যখাতে সেখানে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনা পর্যন্ত সরকারের ব্যয়বরাদ্দ এইরূপ:

পরিকল্পনা	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ
বাজেটের যত অংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ	৩·৩%	৩·০%	২·৬%	২·১%	১·৭%	১·৯%

সামান্য পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং পয়ঃপ্রণালী গ্রামাঞ্চলে করলে যেখানে ৭০ভাগ রোগ প্রতিরোধ সম্ভব, সেখানে এই ৩৪ বছরেও তা করা হলো না। এই কথাগুলোর উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে চলুক, অপুষ্টিতে প্রতিমাসে হাজার হাজার লোক মারা যাক, খেতে না পেয়ে শিশুরা অন্ধ হয়ে যাক কিছু যায় আসে না কিন্তু আর্যভট-ভাস্কর-রোহিণী-অ্যাপল আরো বেশী সংখ্যায় পাঠাতে হবে। সর্বত্র বলা হচ্ছে জনগণের কল্যাণেই কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হচ্ছে এবং সে জনগণের প্রাথমিকশিক্ষার সামান্য সুযোগটুকু কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের জন্যই নাকি টিভিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হচ্ছে। অপূর্ব! সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

পাঁচ

জনস্বার্থ এবং জনকল্যাণ এই দুটি কথার এক সম্মোহনী শক্তি

আছে সেটা সবাই ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে। দেখুন, কালো টাকা সাদা করার আইন জনস্বার্থে, বিদেশ থেকে ঋণ করা হয় জনস্বার্থে, 'সহায়তা'র নামে অসমচুক্তি অন্য কোনো দেশের সাথে করা হলেও তা জনস্বার্থের খাতিরে। খাদ্যে ভেজাল দেওয়া কিংবা শিক্ষাসংকোচন জনকল্যাণের প্রয়োজনে করা হয় কিনা জানিনা তবে শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমিয়ে সামরিক বাজেটবৃদ্ধি করে বিদেশ থেকে যুদ্ধাস্ত্র আমদানী অবশ্যই জনকল্যাণে এবং দেশীয় স্বার্থে। এখন মহাকাশপরিক্রমা ইত্যাদির পেছনে ঢালাও অর্থব্যয়কে যুক্তিযুক্ত করা হচ্ছে জনকল্যাণের কথা বলে। যদি প্রশ্ন করেন মহাকাশগবেষণার কি প্রয়োজন নেই? কৃত্রিম উপগ্রহের কি কোনো উপযোগিতা নেই? উত্তর পরিস্কার। হ্যাঁ আছে। কিন্তু উন্নত সম্পদশালী দেশ ও সমস্যাপীড়িত দরিদ্র দেশের প্রয়োজনের মাত্রাভেদ আছে। জাপানে কিংবা আমেরিকায় রোবটের ক্রমোন্নতি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে কাম্য নয়। বিজ্ঞানচর্চার সাথে সামাজিক প্রয়োজনের নিবিড় সম্পর্ক আছে একথা অনস্বীকার্য। আবহ পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস, প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান, টিভি যোগাযোগ ইত্যাদির সাথে আরেকটি কাজও কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশ থেকে ভালই করতে পারে সেটা হলো অন্যদেশের সামরিক ঘাঁটির ওপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা, বিশেষ করে শত্রু দেশের। এছাড়াও যে রকেটে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো যায়, তারই সামান্য অদল-বদল করে ক্ষেপণাস্ত্রও ছোঁড়া সম্ভব। আমেরিকা রাশিয়ার ক্ষেত্রে সামরিক প্রয়োজনের বিরাট ভূমিকা মহাকাশপ্রযুক্তিতে বর্তমান এটা স্বীকার করলে কৃত্রিম উপগ্রহ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সামরিক উদ্দেশ্য কিছু পরিমাণেও সাধন করছে না, এটা হতে পারে না।

সমাজবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ড দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন:

Though many now credulously believe that space travel will open up marvellous new possibilities, thare are strong historical grounds for believing rather that this makes the fatal terminus of a process that has from the pyramid age on curbed human development.

মহাকাশ পরিক্রমা সম্পর্কে তিনি এর পরেই মন্তব্য করেছেন:

Space exploration itself is strictly a military by-product and without pressure from the pentagon and kremlin it would never have found a place in any national budget. বলাবাহুল্য পেন্টাগণ নয় আজ আমাদের দেশ ক্রেমলিন দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত, অন্তত বাস্তব অবস্থা তাই বলছে, যদিও দুয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বিশেষ আর নেই।

ছয়

১৯৭৪ সালে আমাদের বিজ্ঞানীরা যখন পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাতে ব্যস্ত ছিলেন সেইসময় বিহারে গুটি বসন্তের মড়কে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এই ব্যাপারে অবহেলা করার জন্য সরকারকে তখন ভর্ৎসনা করছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় সঙ্কোচনের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বিদেশী পরিকল্পনায় তৈরী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বহর কিরকম? একটা উদাহরণ দিই। কানপুর IIT-র প্রতি ছাত্রের পেছনে মাথাপিছু বাৎসরিক ব্যয় ৩৯,৮০৯·৯০ টাকা। সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (যার মধ্যে ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারীং ছাত্ররাও আছেন) ছাত্রদের মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় ১৭৪·৮০ টাকা, প্রায় ২২৮ গুণ কম। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। মূলে কী কারণ তা জানতে হবে! এই যে দেশে দারিদ্র বাড়ছে, বেকারী বাড়ছে, সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখদুর্দশা বেড়ে চলেছে, অশিক্ষা না কমে বরং বেড়ে চলেছে, পাশাপাশি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদের সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও শিল্পে বিদেশী নির্ভরতা, অন্যদেশে মগজ সরবরাহ এসবের কারণ একটি জায়গাতেই। খুব যথার্থভাবেই 'আজকালে' প্রকাশিত 'এই গ্রহের রোদন' শীর্ষক নিবন্ধে শেখর মুখোপাধ্যায় সেই মূল কারণটি ব্যক্ত করেছেন। আসল ব্যাপারটি হলো, 'তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের আভ্যন্তরিক কিছু সংখ্যক মানুষের দ্বারাই যারা দেশগুলির ঐশ্বর্য-সম্পদ-শিক্ষা-ক্ষমতার সিংহভাগটা ভোগ করে; শিক্ষিতজন, বুদ্ধিজীবী, সত্ত্বভোগী, ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক ক্ষমতাশালীরা যার মুখ্য শরিক। ব্যুরোক্র্যাট ও টেকনোক্র্যাটরা যে ব্যবস্থার মুখ্য হাতিয়ার। সেজন্যই এদের কারো কাছেই দেশের অধিবাসীগণের মুখ্য অংশটার দারিদ্রমোচন কখনই কাম্য মনে হয় না, শুধুমাত্র গলেস্তারা লাগানর কথাই ওঠে, এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দারিদ্রমোচনে বাধাও দেয়।

এই শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিচর্চা, রাজনীতি ও পরিকল্পনা, সব, সবই থাকে দেশের জনগণের সিংহভাগের দুঃখদুর্দশা মোক্ষণের লক্ষ্যভেদের থেকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে।'

নির্মমভাবে অপ্রিয়সত্য তুলে ধরেছেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। আমাদের দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ যে যে কাজ করছে বা করবে সেগুলো বিচার করা যাক্। টেলি যোগাযোগব্যবস্থার আধুনিকীকরণ নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব যে দেশে ঘটেছে সেই রকম একটি দেশে খুব জরুরী নয়। আর প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান নিশ্চয়ই ভালকাজ কিন্তু যারা আমাদের দেশের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে নিজেদের সম্পদের ভাণ্ডার স্ফীত করে, শেষপর্যন্ত এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা যে তাদেরই স্বার্থসিদ্ধি করবে তা স্বতঃসিদ্ধ।

যে দেশে দেশীয় পরিকল্পনায় তৈরী না বলে বাঁধগুলো আজ অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবছর যার জন্য হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তিহানি ঘটে সে দেশে আবহপূর্বাভাষ বা জলসম্পদের গবেষণার শুধু তত্ত্বগত সাফল্যই থাকবে, ব্যবহারিক উপযোগিতা সুদূরপরাহত।

সাত

সমগ্র মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে যা জনসংখ্যা তার দ্বিগুণ মানুষ ভারতবর্ষে অপুষ্টিতে ভোগে। শিশুমৃত্যুর হার বিশ্বে সর্বাধিক আমাদের দেশে। ৪১ কোটিরও বেশী লোক নিরক্ষর। এসব নিয়ে আমরা তৃতীয় বিশ্বশক্তি হতে চলেছি!

অ্যাপলফে সামনে রেখে যখন স্বাধীনতার হিসাবনিকেশ করার প্রচেষ্টা চালান হয়, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে জন-বিরোধী ভূমিকা অপরিবর্তিত রেখে জনদরদী সাজার চেষ্টা চলে, বিদেশী ঋণের কাছে বিকিয়ে যাওয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা আড়াল করতে যখন বৈজ্ঞানিক সাফল্য জোরগলায় প্রচার করা হয় তখন মনে হয় মহাকাশগবেষণা শুধু নয়, সমস্ত কর্মসূচীই জনস্বার্থ নয়, সেই মুষ্টিমেয়ের স্বার্থই রক্ষা করে চলেছে॥

প্রবন্ধ সূত্র :

১। 'মহাকাশ উপনিবেশের সূচনা' / আজকাল

২। 'মহাকাশ গবেষণায় কলম্বিয়া তৃতীয় যুগের সূচনা করল / সমরজিৎ কর / দেশ

৩। 'এই গ্রহের রোদন' / শেখর মুখোপাধ্যায় / আজকাল

৪। 'ইসরো থেকে ফিরে' / সমরজিৎ কর / দেশ

৫। মেট্রোপলিটন মন-মধ্যবিত্ত ও বিদ্রোহ / বিনয় ঘোষ

৬। নিশান ছাত্রসংগ্রামের মুখপত্র

সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

রসায়নবিদ লিওনার্দো দা ভিন্সি

[2রা মে 1982 লিওনার্দো দা ভিন্সির 530তম জন্মদিন অতিক্রান্ত হল। এই উপলক্ষ্যে বিস্ময়কর এই প্রতিভার অজানা আর এক দিক নিয়ে এই প্রবন্ধ।]

লিওনার্দো দা ভিন্সির 530তম জন্মদিন অতিক্রান্ত হল গত 2 রা মে 1982। নিজের যুগের থেকে অন্তত 400 বছর এগিয়ে থাকা সর্বযুগের বিস্ময় এই প্রতিভাটির সঞ্জীবনী-স্পর্শে পরিপুষ্ট হয়নি বিজ্ঞান বা কলার এমন কোন বিভাগ খুঁজে পাওয়া আজও বেশ দুষ্কর। তবু মানুষের স্মৃতি বড় দুর্বল। তাই ভিন্সি এবং মোনালিসা এই দুটি শব্দ আমাদের অনেকের কাছে প্রায় সমার্থক হয়ে থাকলেও গণিত, পদার্থবিদ্যা, কারিগরি বা শারীরতত্বে তাঁর অবদানের কথা আমাদের বোধহয় আজ আর ততটা করে মনে পড়েনা। আজ থেকে প্রায় 500 বছর আগে যখন বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদই প্রায় ছিলনা এবং "পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান" বলে কোন শব্দ সৃষ্টি হয়নি সেই যুগে বসে প্রায় একক এবং অনন্য প্রচেষ্টায় লিওনার্দো শব্দতরঙ্গ, তরলের চাপ, চুম্বকতত্ত্ব ইত্যাদি এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উপর পরীক্ষামূলক গবেষণা চালিয়ে গেছেন ক্রমাগত। শবব্যবচ্ছেদ করে মানবদেহের বিভিন্ন অংশের যে সচিত্র বিবরণ তিনি রেখে গেছেন গ্রের অ্যানাটমির আধুনিকতম সংস্করণের সাথেও তার তফাৎ খুব সামান্যই। তার এই বিবরণে হৃদযন্ত্র ও হৃদকপাটের কার্যকলাপ, রক্তসংবহন প্রক্রিয়া ইত্যাদি নানা শারীরবৃত্তীয় গঠন ও ক্রিয়াকলাপের অতি আধুনিক নিদর্শন পাওয়া যায়। এককথায় লিওনার্দোকে আধুনিক পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞানের জনক বলা যেতে পারে।

স্বল্পকাল আগেও লিওনার্দোর জীবনীকার ও তাঁর সম্পর্কে গবেষকদের কাছে যে বিষয়টি অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে ঠেকেছে তা হল যুগোত্তীর্ণ প্রতিভাধর লিওনার্দো রসায়ন নিয়ে কোন গবেষণা করেননি কেন? বিভিন্ন সময়ে লেখা লিওনার্দোর পাণ্ডুলিপি মহাকালের আগ্রাসন নীতিকে পেরিয়েও যেটুকু পাওয়া গেছে তা সংখ্যায় প্রচুর, আয়তনে বিশাল। এইসব পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। সেটা হল তিনি লিখতেন বাঁদিক থেকে ডানদিকে নয়, অসাধারণ মানুষটি লিখতেনও অসাধারণ ভাবেই—ডানদিক থেকে বাঁদিকে এবং তাও এমনভাবে যা আয়নায় ধরলে তবেই সোজা হয়ে চোখে পড়বে।

এভাবেই তিনি লিখে যেতে পারতেন পাতার পর পাতা অনায়াস ভঙ্গিতেই। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত তাঁর এইসব কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে গবেষকরা দেখেছেন লিওনার্দোর অনুসন্ধিৎসার সুবিশাল ক্ষেত্রের অপরিমেয়তা। তাই লিওনার্দোর এই পাণ্ডুলিপির সঞ্চয়ের মধ্যে রসায়নের উপর কোন গবেষণাপত্র না থাকাটা খুবই আশ্চর্যের। এযাবৎ প্রচলিত ব্যাখ্যায় একথাই বলা হত যে 'রসায়নের গবেষণাপত্র থাকবে কি করে! সে যুগে রসায়ন বলেই কিছু ছিলনা—যা ছিল তা হল অপরসায়ন (অ্যালকেমিস্ট্রি)' এবং অপরসায়ন সম্পর্কে লিওনার্দোর অ্যালকেমিস্টদের প্রতি কটাক্ষপাত—"Living interpreters of nature" আজ সুবিদিত।

তবু মনের কিন্তুভাব যায়নি। রসায়ন না হয় ছিলনা, প্রকৃতি তো ছিল আর সেই প্রকৃতির বিস্ময়ের রাজ্যে রসায়নের যে ভূমিকা আজ দেখা যায় সেদিনও তাই ছিল। তাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিপড়ুয়া লিওনার্দোকে প্রকৃতি তার সেই দুনিয়াতে হাতছানি দিয়ে ডাকেনি এবং ডাকলেও সে ডাকে লিওনার্দো সাড়া দেননি একথা এককথায় মেনে নেওয়া মুশকিল। পরবর্তীকালে তাই লাভিস্লাও রেতি নামে এক রসায়নবিদ কঠোর শ্রমসাধ্য সেই গবেষণায় বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত লিওনার্দোর যাবতীয় কাগজপত্র ঘেঁটে যা দেখেছিলেন সে সম্পর্কেই এখানে আলোচনা করছি।

বাঘা বাঘা রসায়নবিদদেরও রসায়নের যে সমস্যাটি বহুদিন ধরে ভাবিয়েছে, তা হল দহন। এই দহন নিয়ে বহু গবেষণা হওয়ার পরও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে তৎকালীন স্বনামধন্য বিজ্ঞানীরাও ভুল ফ্লজিস্টন তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ এর প্রায় 300 বছর আগে দহন ক্রিয়ায় বায়ুর ভূমিকা ও তার প্রায় সঠিক ব্যাখ্যা লিওনার্দো দিয়ে গিয়েছিলেন। মিলানের Amfrosian লাইব্রেরীতে রাখা "Codice Attantico" নামে একটি গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে লিওনার্দোর যে রসায়নচর্চার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাতে শুধু রাসায়নিক ঘটনা 'দহন'কে নিয়ে তাঁর লেখার কথা জানা গেছে। সেখানে অগ্নিশিখা সম্বন্ধে একজায়গায় তিনি বলেছেন "যেখানে আগুনের শিখা উৎপন্ন হয় সেখানে বায়ুর প্রবাহ ঘটে এবং সেই প্রবাহ শিখাকে আরও উজ্জ্বলভাবে বাড়িয়ে তোলে"·····

"বাতাসের যে অংশ দহনশিখার কলেবর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে শিখা বায়ুর সেই অংশকে অবিরত শোষণ করে চলে এবং আরও বায়ু সেই অংশে ছুটে না এলে এবং শূন্যতার সৃষ্টি হয়"।।

শিখার প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলছেন—"যেখানে শিখা বাঁচতে পারেনা সেখানে শ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণকারী কোন প্রাণীও বাঁচতে পারেনা। অতিরিক্ত বায়ু শিখা নির্বাপিত করে এবং মাঝামাঝি পরিমাণ শিখাকে পুষ্ট করে।"

প্রাচীনকালে জানা ছিল যে দহনের জন্য বায়ু প্রয়োজন হয়। কিন্তু বায়ু দহনক্রিয়ায় কিভাবে অংশগ্রহণ করে সেই ধারণা লিওনার্দোই প্রথম প্রায় ল্যাভয়সিয়ারের তিনশ বছর আগে বিবৃত করে গেছেন। বায়ু যেন দহনের খাদ্য এবং এর অভাবে শিখার শ্বাসরুদ্ধ হয় ঠিক যেমন বায়ুর অভাবে আমাদের শ্বাসরোধ হয়ে আসে।

আবদ্ধপাত্রে লিওনার্দো যে দহনের পরীক্ষা করেছিলেন তা আজ সুপ্রমাণিত। তাঁর বিভিন্ন নথিপত্র থেকে বহুবার জলপাত্রে রক্ষিত প্রজ্বলিত কাঠকয়লার উপর উপুর করা পাত্রের পরীক্ষার সচিত্র বিবরণ পাওয়া গেছে। তিনি সেই পরীক্ষায় দুটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন—(ক) কাঠকয়লা বা মোমবাতি জ্বলে কেবলমাত্র কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং (খ) দহনক্রিয়া হয়ে গেলে পাত্রের জলতল উপরে উঠে যায়।

দহনের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তা জলীয় বাষ্পকে আকর্ষণ করে,—এই ধারণার স্বপক্ষে তিনি যুক্তি দেখাচ্ছেন এইভাবে—একটি জলপাত্রে রাখা জ্বলন্ত কাঠকয়লার উপর উত্তপ্ত একটি পাত্র উল্টিয়ে রাখলে দেখা যাবে যে বাষ্প দহন শিখাকে অনুকরণ করে উপরে উঠে ওলটানো পাত্রকে কিছুটা পূর্ণ করছে এবং এই পাত্রের আবদ্ধ বায়ু খোলা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি আবার বলছেন যে ব্যাপারটা আমরা আমাদের চোখের সামনে ঘটা দৈনন্দিন ঘটনা দিয়ে বুঝতে পারি। যেমন একটা ভেজা কাপড় আগুনের উপর ধরলে দেখা যাবে যে ভেজা অংশটা ক্রমশঃ আগুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত তা কাপড় ছেড়ে আগুনের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং কাপড়টা শুকিয়ে যাচ্ছে। ঠিক এইভাবেই সূর্য জলীয় বাষ্প শোষণ করে।

লিওনার্দোকে জীবনের শেষের দিকে যে ভাবনাটা বেশী ভাবিয়েছিল সেটা হল সমুদ্রের জল কিভাবে পাহাড়ের মাথায় ওঠে। এটা কি সূর্যের তাপের দ্বারা সম্পন্ন হয় যেমন করে ভেজা কাপড় শুকাবার কথা বলা হয়েছে নাকি অন্য কিছু? পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপকেই এজন্য দায়ী করেছিলেন যদিও এ ধারণা আজ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। সূর্যের উত্তাপকেই এঘটনার কারণ হিসাবে আমরা জেনেছি।

লিওনার্দো যৌবনের বিস্ময় নিয়ে প্রকৃতিকে দেখেছেন। যৌবনের উদ্যম নিয়ে তার ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন এবং সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন কি করে আরও ভালভাবে বাঁচার কাজে মানুষ প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে পারে। জীবনের শেষভাগে এসেও জীবনের প্রায় প্রারম্ভে শুরু করা তাঁর দহনের উপর গবেষণা তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন এ কারণে। তিনি চিন্তা করেছিলেন যে দহনের ফলে জল উপরে ওঠে—সূর্যের উত্তাপ

জলকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় মানুষের অনধিগম্য পর্বতচূড়ায়। এই পদ্ধতির নকল কি মানুষ করতে পারেনা। অনেকেরই মতে লিওনার্দোর ফ্লাইং মেশিনের পরিকল্পনা এই চিন্তারই প্রতিফলন। 1452 থেকে 1519 সাল এই সাতষট্টি বছরের ব্যবধানে 2রা মে তারিখটিই এই মহান প্রতিভার চিরসমাপ্তি ঘটে।

[ভিন্সি যে সমস্ত রাসায়নিক কাজকর্ম করেছিলেন সেগুলির কোনটাই কোন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রূপে পাওয়া যায় নি। তাঁর বিভিন্ন জীবনীকার ও পর্যালোচক তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে যা পেয়েছেন তা থেকেই এই নিবন্ধ রচিত হয়েছে। এখানে নির্দেশিকা হিসাবে কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করা হল।]

1. Clark Kenneth, "A Catalogue of the drawings of Leonardo da Vinci, in the collection of H.M. the king, at windsor Castle," University Press, Cambridge, 1935.

2. "II Codice Atlantico" di LEONARDO DA VINCI, nella Biblioteca Ambrosiasna di Milano, riprodotto e pubblicato dalla R. Accademia deilincci, da Giovanni Piumati, Hoepli, Milano 1894—1904, Page—237, 270, 400 v.a.

3. Vol. I, II Codice Arundel 263, Danegi, Roma, 1923—30.

4. Richter, J.P., "The Literary works of Leonardo da Vinci", 2nd ed., Oxford University Press, London, 1939.

5. Gregory, Joshuac., "Combustion form Heracleitos to Lavoisier," Edward Arnold & Co., London, 1934

6. Stillman, J.M. "The story of Early Chamistry," Appleton, New York, 1924.

7. White, J.H., "The History of the Phlogiston Theory," Edward Arnold & Co., London, 1932

সঞ্জয় কুমার ভট্টাচার্য্য
ও রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরণ্যের কথা

স্বপ্ন, কুহক আর মায়ার রাজ্য অরণ্য। ব্যবসায়ী ঠিকাদারের চোখে মুনাফার অনন্ত উৎস অরণ্য। আদিবাসী গোষ্ঠীর কাছে কঠোর জীবনসংগ্রামের স্বাভাবিক ক্ষেত্র অরণ্য। সঙ্কটাপন্ন বিপর্যস্ত সভ্যতার অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির অপরিহার্য সর্ত অরণ্য।

ভারতের প্রায় সাড়ে সাত কোটি হেক্টর জমি জুড়ে রয়েছে অরণ্য। এই অরণ্য দেশবাসীকে জোগায় শিল্পের কাঁচামাল, বাড়ীর আসবাবপত্র, জ্বালানীর কাঠ। এই অরণ্য রক্ষা করে জমিকে, ভারসাম্য বজায় রাখে প্রকৃতির ও পরিবেশের। আর এই অরণ্যই লালন-পালন করে অরণ্যবাসী উপজাতি ও গোষ্ঠীগুলিকে, যাদের উপর সতত উদ্যত সভ্যতার ভ্রূকুটি।

এই অরণ্যকে ঘিরে আজ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে সামাজিক সংঘাত আর দ্বন্দ্ব। প্রয়োজনের তুলনায় দ্রুত—অতি দ্রুত—ক'মছে অরণ্যের আয়তন আর বনজ সম্পদের পরিমাণ। ক্ষুধিত শকুনের মত অরণ্যকে ক্ষত-বিক্ষত করে বনজ সম্পদ লুটছে ব্যবসায়ী ঠিকাদারেরা। নগর সভ্যতা শুষে নিচ্ছে অরণ্যের প্রাণ। বিপর্যস্ত হচ্ছে আরণ্যক গোষ্ঠীগুলির চিরাচরিত জীবন-যাত্রা। ধ্বংসের কাছাকাছি এসে দাঁড়াচ্ছে তাদের জীবন ও জীবিকা। ব্যবসায়ী-মহাজন-আমলার চাপে গোষ্ঠীগুলি বিচ্ছিন্ন হ'চ্ছে তাদের প্রথাগত কৃষিব্যবস্থা থেকে, বাঁধা প'ড়ছে সর্বগ্রাসী ঋণের পাকে, হারাচ্ছে অরণ্যের উপর তাদের বহুদিনকার অলিখিত অধিকার। মিলিত আক্রমণের মুখে যখনই এরা মরীয়া হ'য়ে আঁকড়ে ধ'রছে জীবন-জীবিকা-অধিকার তখনই নির্মম রূঢ়তা নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে রাষ্ট্র। আর অসাধারণ তৎপরতায় প্রচার-মাধ্যমগুলি শহর-বাসীদের মনে ক্ষোভ, তাচ্ছিল্য, ঘৃণা

জমিয়ে তুলছে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে।

অথচ বনজ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে প্রধানত তথাকথিত সভ্যতারই প্রয়োজন মেটাতে। এই প্রয়োজন মেটানর নাম করেই অবিশ্বাস্য মুনাফা কামাচ্ছে ঠিকাদার-ব্যবসায়ী-ইজারাদারেরা। তবু অভিযোগের বর্শামুখ এদের দিকে ঘোরানোর সাধ্য বা সাধ নেই সরকারের, নেই প্রচারমাধ্যমগুলির। কারণ তার থেকে অনেক সহজ কাজ হল আদিবাসীদেরকেই বন ধ্বংসের জন্য প্রধানত দায়ী করা। তাতে খুব সুবিধাজনক ভাবে আড়াল করা যায় বনজসম্পদ ধ্বংসে নীতিহীন বিবেকহীন নগরসভ্যতার ন্যক্কারজনক ভূমিকা, আড়াল করা যায় সরকারের সীমাহীন ঔদাসীন্য আর ব্যর্থতা, আড়াল করা যায় মুনাফাখোরদের বেপরোয়া বেআইনী কার্যকলাপ আর আদিবাসীদের কিছু কিছু ক্রিয়াকলাপের দিকে আঙুল দেখিয়ে মানুষের বিক্ষোভকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তাদের প্রতি।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভারসাম্য রক্ষায় অরণ্যের ভূমিকা আজ বহুবিদিত। বনধ্বংসের কারণে প্রতি বছর 600 কোটি টন পরিমাণ জমির উপরের দিককার মাটি ('টপ-সয়েল') নষ্ট হচ্ছে। বৃষ্টিপাত কমছে। কর্ণাটকের উত্তর কানাড়া জেলায় এক লক্ষ হেক্টর বনভূমি কমে যাওয়ায় সেখানকার বৃষ্টিপাত কমেছে ষোল শতাংশ। বনধ্বংসের ফলে বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। অরুণাচল প্রদেশের উত্তর-পূর্ব বনভূমি বিনষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মপুত্রের মেঝে চোদ্দ ফুট উঁচুতে উঠে গেছে এবং আসামে প্রতিবছর বন্যা দেখা দিচ্ছে। গত দশবছরে বন্যা অধ্যুষিত এলাকা বেড়েছে দু কোটি হেক্টর পরিমাণ। বছরে বন্যার দরুণ ক্ষতির গড় পরিমাণ এখন হাজার কোটি টাকা। এর অন্যতম কারণ বনধ্বংস। বনধ্বংসের ফলে ভূমির স্থায়িত্ব নষ্ট হয়ে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণই বাড়ে, নদীর মেঝে আর জলাধার গুলিতে পলি জমে। ঊনচল্লিশটি বড় নদীপ্রকল্প এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চাষে অবর্ণনীয় ক্ষতি হচ্ছে। বহু পরিবার পড়ছে ভয়াবহ দুর্দশার কবলে।

এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের তরফ থেকে সরকারের উপর চাপ আসছে অরণ্য সংরক্ষণের জন্য। কিন্তু ফল কি দাঁড়াচ্ছে? কিছু লোক-দেখানো সরকারী প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, আদিবাসী গোষ্ঠিগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্যায় আইনের বেড়ি, সন্ত্রাস আর দমন, আর কিছু পশ্চিমী সংস্থার সহায়তায় অরণ্য সংরক্ষণের নামে চালু করা হয়েছে ব্যাপক হারে অরণ্যের ভারসাম্য ধ্বংসের কর্মসূচী। অরণ্যসংরক্ষণ প্রকল্পগুলির অধিকাংশই বিদেশী 'সহায়তা'য় পুষ্ট। এই 'সহায়তা' সত্যিই আমাদের দেশের অরণ্যসম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেওয়া কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রাকৃতিক অরণ্যে বিভিন্ন ধরনের গাছপালার সমন্বয়ে যে ভারসাম্য থাকে এবং বিশেষ করে জল-চক্র বজায় রাখার পিছনে প্রাকৃতিক অরণ্যের যে ভূমিকা, মাত্র এক ধরণের গাছের সাহায্যে তৈরী কৃত্রিম অরণ্যে তা সম্ভব নয়। পশ্চিমী সাহায্যে তৈরী উত্তরখণ্ডের পাইন অরণ্যে অথবা বস্তার ও নিলগিরির ইউক্যালিপটাস অরণ্যে মাটির নিচের জলের সঞ্চয় প্রাকৃতিক অরণ্যের তুলনায় অনেক কম। মধ্যপ্রদেশের বস্তারে এক হাজার হেক্টর জমিতে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সুপারিশে ও বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপ থেকে পাইন গাছ এনে লাগানোর প্রকল্পটি এই ধরণের কৃত্রিম অরণ্য তৈরীর অবাস্তবতার চমৎকার নিদর্শন। পাইন গাছগুলি বস্তারের আবহাওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এগুলি একটি ব্যাপক অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক গাছপালা বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

(কৃত্রিম) অরণ্যের অভিশাপ

দেশের বিভিন্ন অংশে বনবিভাগ বাণিজ্যিক গাছের চারা লাগিয়ে প্রাকৃতিক অরণ্যের পরিবর্তে কৃত্রিম অরণ্য সৃষ্টি করছে। এই পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী ফল ভয়াবহ। প্রাকৃতিক অরণ্যে নানা রকম গাছ-গাছড়া থাকে, লম্বা, মাঝারি গাছ, গুল্ম আর ঘাস ছড়িয়ে আছে অরণ্যে। বেড়ে ওঠার জন্যে এরা পুষ্টি আর জল আহরণ করে মাটি থেকে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর অক্সিজেন নেয় বায়ুমণ্ডল থেকে। গাছের ঝরে যাওয়া শুকনো পাতায় মাটি উর্বর হয়। লিপুথিনাস গাছের মূলে এক ধরণের ব্যাক্টেরিয়া থাকে যা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে জমির পুষ্টিকারী পদার্থে পরিণত করে। অরণ্যের প্রাকৃতিক আচ্ছাদন বৃষ্টির বেগ কমিয়ে দিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করে। এই আচ্ছাদনের ফলে বৃষ্টির জল মাটির ভিতরে ধীরগতিতে অনুপ্রবেশ করে। এই জলই শুখার সময় নদী খাল আর কুয়োর জলের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। গাছের মূল মাটিকে এমনভাবে বেঁধে রাখে যে জমির ক্ষয় ও ধ্বস নামা

অনেকাংশে কমে যায়। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের সরবরাহ বেড়ে যায়। অরণ্যের সবুজ আচ্ছাদন ঐ অঞ্চলের বায়ুর আর্দ্রতা রক্ষা করে আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে। এছাড়াও পোকামাকড় পশুপাখীতে ভরপুর থাকে প্রাকৃতিক অরণ্য। এরা এদের রসদ সংগ্রহ করে গাছগাছড়া থেকে বা অন্যান্য প্রাণী থেকে। এই পশুপাখী আবার অরণ্যের সহায়তা করে পরাগসংযোগ ঘটিয়ে, বীজ ছড়িয়ে আর বিষ্ঠা ত্যাগ করে। এর ফলে জমির উর্বরতাও বেড়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা হল অরণ্যের কাছাকাছি যে মানুষেরা বাস করেন তারাও অরণ্যসম্পদ রক্ষা করেন।

এই কারণে অরণ্য একটি পূর্ণ সাম্য অবস্থা। পরিবেশের সাম্য বজায় রাখার কাজে অরণ্য সহায়তা করে। এই ভারসাম্য বিনষ্ট হলে অচিরেই তা পরিমণ্ডলকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। কৃত্রিম অরণ্যের এই ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। প্রাকৃতিক অরণ্যের গাছপালা আর পশুপাখী হয় এর প্রথম বলি। ফলে, জমির পুষ্টিশক্তি কমে যায়। মাটির বাঁধন আলগা হয়, বৃষ্টির হাত থেকেও আর রেহাই পাওয়া যায়না। ভূমিক্ষয়, বন্যা আর ধ্বস নেমে আসে বায়ুর অক্সিজেন ও আর্দ্রতা কমে যায়। ফলে গাছের বেড়ে ওঠাও বন্ধ হয়। অনিবার্যভাবেই ধ্বংসের চক্র গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে উত্তরখণ্ডের পাইন বনে ফার্ণ জাতীয় গাছ লেংড়া, খাদ্যের অভাবে আর বুনো ঘাস রিংগল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই সময় গাছ লাগানোর ফলে জমির অম্লতা বেড়ে যায় ও উর্বরতা নষ্ট হয়। এই সমস্ত জমিতে নেড়া টিলার সমপরিমাণ ভূমিক্ষয় হয়। নীলগিরিতে ওয়াট্‌ল্ আর ইউক্যালিপ্‌টাসের চাষের ফলে নদীর জলপ্রবাহ ব্যাহত হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মকে অবজ্ঞা করে কৃত্রিম অরণ্যসৃষ্টি আমাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।

বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় হিমালয়ে পাইন অরণ্য অথবা কর্ণাটকের কোলার জেলায় ইউক্যালিপ্‌টাস অরণ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। SIDA নামে সুইডিশ সংস্থাটির সহায়তায় তামিলনাড়ুতে যে 105 কোটি টাকার অরণ্যপ্রকল্প নেওয়া হ'য়েছে তার উদ্দেশ্য স্পষ্টতই সুইডিশ দেশলাই কোম্পানি 'উইম্‌কো'র স্বার্থসিদ্ধি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে অধিকাংশ কৃত্রিম অরণ্য প্রকল্পেরই নীট ফল প্রাকৃতিক অরণ্যের ভারসাম্য নষ্ট করা, আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া, আর কাগজ, দেশলাই, আসবাব ইত্যাদি শিল্পের স্বার্থ-সিদ্ধি করা।

অরণ্যের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। সংকট অতি তীব্র। পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষের অধিকার, সব কিছুর ব্যাপারে উদাসীন সরকারী আমলাতন্ত্র এই সংকটের দিনে অরণ্য সংরক্ষণের যে পথ নিয়েছে, তাতে সংকট আরো দ্রুত ঘনীভূত হ'তে বাধ্য। অরণ্যকে ঘিরে স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত আরো তীব্র হতে বাধ্য। 1927 সালের ভারতীয় অরণ্য আইনের বদলে নতুন এক অরণ্য আইন সম্ভবত শীঘ্রই বলবৎ হ'তে চলেছে। এই আইনের বলে আদিবাসী ও অন্যান্য গ্রামীন জনগোষ্ঠীগুলির চিরাচরিত প্রথাগত বহু অধিকার এক কলমের খোঁচায় নস্যাৎ হ'য়ে যাবে, অরণ্যের উপর কায়েম হবে আমলাতন্ত্রের নাগপাশ, আর আমলাতন্ত্রের ছত্রছায়ায় অরণ্যের বুকে অবাধে বিচরণ করবে ব্যবসায়ী ইজারাদারদের দল।

অরণ্যের ছায়া স'রে গেলে দেখা যাবে আজকের সভ্যতার মরুভূমি খড় রুক্ষ।

[পিপ্‌ল্‌স ইউনিয়ন অভ ডেমোক্রাটিক রাইটস্ কর্তৃক প্রকাশিত (এপ্রিল, 1982) 'আনডিক্লেয়ার্ড সিভিল ওয়ার' (অঘোষিত গৃহযুদ্ধ) পুস্তিকা অবলম্বনে রচিত।]

অভিজিৎ লাহিড়ী
বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ।

6 আগষ্ট 'হিরোশিমা দিবসে'র কেন্দ্রীয় মিছিল সফল করুন !
এলাকায় এলাকায় 'হিরোশিমা দিবস' পালন করুন !

এ্যালার্জি

এ্যালার্জি শরীরের একধরণের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার একটি অবস্থামাত্র। বিভিন্ন রকমের খাদ্য, ওষুধ, পরাগরেনু বা ধূলিকনার ফলে মানবদেহে এই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। বহুযুগ আগেও মানুষের এ বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা ছিল। 3000 B.C.-তে চীনের সম্রাট শেননাও গর্ভবতী মহিলাদের মুরগীর ও ঘোড়ার মাংস খেতে বারণ করতেন। হিপোক্রিটিস বলতেন 'মাথা ধরলে গরম দুধ দিও না'। খাদ্য এ্যাল্যার্জি সম্পর্কে এর থেকে সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এ্যালার্জি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, শরীরের নির্দ্দিষ্ট ধারাবাহিকতার বাইরে কোন জীবাণু প্রবেশ করতে চাইলে শরীর তা প্রতিরোধ করে 'স্মল লিম্ফোসাইট' নামক শ্বেতকণিকা থেকে এন্টিবডি সৃষ্টি করে। অনুপ্রবেশকারী জীবাণুকে বলা হয় এন্টিজেন। পরিমণ্ডলে বিভিন্নরকমের এন্টিজেন থাকে। যেমন ধূলিকণা পশুর লোম, উল, বিভিন্ন ওষুধ যথা এ্যাসপিরিন, সালফানিমাইড, পেনিসিলিন প্রভৃতি এন্টিজেন প্রবেশ করলে এন্টিবডি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এন্টিবডি অপেক্ষাকৃত সবল হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়না কিন্তু দুর্বল হলে এন্টিজেনের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির ফলে হিস্টামিন ও সেরোটোনিন নামক রাসায়নিক দ্রব্য নিঃসৃত হয়। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলি শারীর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার হেরফের ঘটায় এবং এ্যালার্জির উপসর্গ দেখা দেয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে এর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন রকম। নাকে এ্যালার্জি হলে জ্বর হতে পারে, ফুসফুসে হলে এ্যাজমা, চামড়ায় হলে চর্মরোগ দেখা দেয়।

ফুড এ্যালার্জি ঃ ফুড এ্যালার্জি শরীরের যেকোন অংশে দেখা দিতে পারে—চোখ, কান, চামড়া, স্নায়ুতন্ত্র, গ্যাসট্রোইনটেসটিনাল, গ্যাসট্রো-ইউরিনারি সিস্টেম এ্যালার্জিতে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে সর্দ্দিকাশি, ব্রংকিয়াল এ্যাজমা, চোখে জল ও পিচুটি পড়া, চুলকানি, মাথা ধরা, পেটের গোলমাল, তলপেট ব্যথা হওয়া, গা-হাত-পা ভার লাগা অতিমাত্রায় ঘাম হওয়া, মাংসপেশীর সংযোগস্থলে ব্যথা হওয়া উপসর্গগুলির মধ্যে অন্যতম। ফুড এ্যালার্জি হলে উপসর্গগুলি খাদ্যগ্রহণের 15/20 মিনিটের মধ্যে অথবা কয়েকদিন পরে দেখা দিতে পারে। যাদের এ্যালার্জিতে আক্রান্ত হওয়ার বংশগত ইতিহাস আছে, তাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগ।

একই গোষ্ঠীভুক্ত দশ ধরণের এ্যালার্জির খাদ্যদ্রব্যের তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ—

1. চীনেবাদাম, শিম, সয়াবীন
2. দুধ ও দুগ্ধজাত সমস্ত খাদ্য যথা গুঁড়োদুধ, চীজ, মাখন, আইসক্রীম, রসগোল্লা প্রভৃতি (দুধ সবচেয়ে বেশী এ্যালার্জিক। শিশুদের কাছে গরুর দুধ, মায়ের দুধের চাইতে সাতগুণ বেশী এ্যালার্জিক। দুধে এ্যালার্জি থাকলে দই খেলেও এ্যালার্জি হতে পারে)।
3. ধান ও সমজাতীয় শস্যের রুটি, কেক, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি। বাদামতেল, চীনেবাদামের মাখন, শস্যজাতীয় খাদ্যদ্রব্য।
4. মটর, কলাই জাতীয় খাদ্য, শিম, মটর বাদাম, সয়াবীন-জাতীয় খাদ্য ও তেল।
5. ডিম ও ডিম থেকে তৈয়ারী নানান খাদ্য।
6. অম্লজাতীয় ফল—কমলা, বাতাবী ইত্যাদি।
7. টমাটো, টমাটো দিয়ে তৈরী খাদ্য।
8. গম, আটা, ভাত, বার্লি, বেকারী জাতীয় দ্রব্য।
9. কেক, রোল, চিনি বা মিছরি দেওয়া খাবার, আপেল প্রভৃতি।
10. রং দেওয়া পানীয়, ওষুধ, রং দেওয়া খাবার।

চিকিৎসা-পদ্ধতি ঃ বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ্যালার্জির চিকিৎসা করা হয়। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদ, আকুপাংচার প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগ করে এর চিকিৎসা সম্ভব। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী পদ্ধতি হল আকুপাংচার। আকুপাংচারে বাইরে থেকে কোন তেষজ শরীরে দেওয়া হয়না। ফলে শরীরের ভারসাম্য প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। গবেষণা করে দেখা যাচ্ছে যে, আকুপাংচারে গামাগ্লোবিউলিন বা এন্টিবডি বাড়তে পারে। আকুপাংচারের 2/1 দিন পর এন্টিবডি বাড়তে শুরু করে। আজকাল চীনের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রক্তআমাশায় প্রভৃতি রোগও আকুপাংচার করে সারানো হয়।

ফুড এ্যালার্জির চিকিৎসা ঃ যে কোন এ্যালার্জির চিকিৎসায় এন্টিবডি বাড়াতে পারলে ফল পাওয়া যায়। ফুড এ্যালার্জির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। যে খাদ্য গ্রহণে ফুড এ্যালার্জি হয় তা

উপবাসের পর যদি এ্যালার্জির উপসর্গ পরিবর্তিত হয় তাহলে নিশ্চিতরূপে বলা যায় ফুড এ্যালার্জি। খাদ্যগ্রহণের সাথে সাথে উপসর্গ লক্ষ্য করতে পারলে চিকিৎসার সুবিধে হয়। দুধ, ডিম, আটা প্রভৃতি বেশী এ্যালার্জিক খাদ্যদ্রব্যগুলো দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিয়ে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাক। কয়েকদিনের ব্যবধানে বর্জিত খাদ্য এক এক করে গ্রহণ করা হল এবং দেখা হল যে উপসর্গগুলোর পুনরাবির্ভাব ঘটে কিনা। এইভাবে বিশেষ ধরণের খাদ্য এ্যালার্জি নির্ণয়কারী পদ্ধতিকে বলা হয় প্রোভোকেসন টেস্ট।

ফুড এ্যালার্জি নিরাময়ের সবচেয়ে ভালো উপায় হল যেসমস্ত খাদ্যের জন্য এ্যালার্জি দেখা দিচ্ছে সেইসমস্ত খাদ্যদ্রব্য তিন বছর না খেয়ে এবং পরে একটু একটু করে খেয়ে লক্ষ্য করা যে এ্যালার্জির উপসর্গসমূহ আর দেখা যাচ্ছে কিনা।

টি, আহমেদ

বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনিকাল মিউজিয়াম।

সদ্য বেরিয়েছে

উৎসমানুষ

বিশেষ বন্যা সংখ্যা

জুলাই-আগস্ট সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত এই বিশেষ সংখ্যার দাম 4 টাকা। রেজিস্ট্রি ডাকে 7 টাকা।

বিস্তৃত খবরাখবরের জন্য লিখুন—

সম্পাদক, উৎসমানুষ

বি, ডি, 494 সল্ট লেক কলিকাতা-64

আমাদের পরবর্তী সংখ্যা (সেপ্টেম্বর '82) প্রকাশিত হবে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে।

মনের মত তুলুন ছবি
রঙীন সাদাকালো,
'মন-আমি'তে সবই পাবেন
ঝকমকে আর ভাল।

স্টুডিও

মন-আমি

MON-AMI

কালার প্রসেসিং ল্যাবরেটরী

62/3, বন্ডেল রোড,
কলিকাতা-700019

রিপোর্ট

বার্ষিক সাধারণসভা

গত 28 মে 1982 পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পঞ্চমবার্ষিক সাধারণ সভা সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্—এর সেমিনার কক্ষে ডঃ জয়ন্ত বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। JACARI-এর তরফ থেকে শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য JACARI এবং বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং এই সভার সাফল্য কামনা করেন।

তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন যে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে জনমত সংগঠিত করার দায়িত্ব রয়েছে। শ্রীহরষিত মজুমদার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বলেন যে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা বিজ্ঞান আন্দোলন, পত্রিকা প্রকাশনা ও বিজ্ঞানকর্মীদের অধিকার রক্ষা সংগ্রামে লিপ্ত। বিজ্ঞান আন্দোলনে বর্তমানে যে জোয়ার পরিলক্ষিত হচ্ছে তারই সাথে তাল রেখে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিয়ে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা জনমানসে বিজ্ঞানচেতনা আনার সংকল্পে বদ্ধপরিকর। বেশ কিছু বিজ্ঞান সংস্থা ও ক্লাব এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন। বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার তরফে স্লাইড সহযোগে কয়েকটি বক্তৃতাও প্রদান করা হয়েছে। জল, বন্যা, দৈনন্দিন জীবনে বলবিদ্যা, সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি স্লাইডের বিষয়বস্তু, এগুলি সাধারণের মধ্যেও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে আরো প্রসারিত করার জন্য বিজ্ঞানসংস্থাগুলির এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা চলছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এ বিষয়ে সহায়তা করেছে। এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হলে যৌথ উদ্যোগে বিজ্ঞান আন্দোলনে সামিল হওয়া সম্ভব হবে। গতবছর সংস্থা যেকটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে তারমধ্যে 'জয়পুরী পা', 'কোসাম্বি ঃ বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক' এবং গত 5 জুনের 'বিজ্ঞানের নিরিখে হোমিওপ্যাথি' সাফল্যের সাথেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থার মুখপত্র 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' 5 বছর অতিক্রম করেছে। নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও মুখপত্রের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। পত্রিকার প্রচারসংখ্যাই তার প্রমাণ। এই পত্রিকায় প্রকাশিত এবং আরো কিছু লেখা দিয়ে একটি সংকলন প্রকাশে সংস্থা উৎসাহী। বিজ্ঞানকর্মীদের স্বাধিকার রক্ষার দাবিতে সংস্থা JACARIকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। PRLএর ডঃ মুকুল সিনহাকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে, BOSE INSTITUTE-এর কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংস্থা সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে। পরিশেষে তিনি সংস্থার সমস্যাবলীর উল্লেখ করেন। রিপোর্ট সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভা শেষে শ্রীসুবীর ধর একটি চমৎকার ম্যাজিক প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে দেখান কেমন করে সামান্য কিছু ম্যাজিকের কলাকৌশল আয়ত্ব করে বাবা এবং গুরুরা নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে দাবী করে থাকেন। বিভূতি থেকে সন্দেশ—বাবাদের ঝুলিতে যা যা আছে সবই তিনি ম্যাজিকের সাহায্যে দেখান এবং এরমধ্যে যে কৌশল ছাড়া আর কিছুই লাগেনা তার সপ্রমাণ দৃষ্টান্ত রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষে আলোচনাটিও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সভা শেষে INDIA : WRITING ON THE SANDS নামে একটি ডকুমেন্টারী ছবি দেখান হয়।

রিপোর্ট

হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত সেমিনার

গত 5 জুন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ও ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল গ্র্যাজুয়েটস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবনে 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোকে হোমিওপ্যাথী' বিষয়ক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব

করেন ডঃ বকুল ভাদুড়ী।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডঃ এইচ কে বিশ্বাস বলেন যে নিজের এবং পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির নিয়মকে লক্ষ্য করেই হ্যানিম্যান ভিত্তিস্থাপন করেন হোমিওপ্যাথীর। কাজ হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি পনেরোজন স্বেচ্ছাসেবী চান। ডঃ আশীষ সিংহ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে হোমিওপ্যাথীকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, Vital force বলতে হ্যানিম্যান বুঝিয়েছেন জড়কেই। বিজ্ঞানের দর্শনের দিক থেকে দেখলে, হোমিওপ্যাথীই একমাত্র চিকিৎসা-পদ্ধতি। ডঃ এ, সি, দত্ত বক্তব্য রাখেন স্লাইড সহযোগে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে হোমিওপ্যাথীকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হলেও, সমাজতান্ত্রিক শিবির একে বর্জন করেছে—তিনি বলেন। নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষার জন্য মানুষের বদলে জীবজন্তু অথবা গাছপালার ওপরে পরীক্ষা চালানো প্রয়োজন।

ডাবল ব্লাইণ্ড পরীক্ষার সাহায্যে সমস্ত ওষুধকে যাচাই করার কথা বলেন ডঃ জ্ঞান শীল। এরপর বক্তব্য রাখেন মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। তিনি বলেন, বিজ্ঞান গড়ে ওঠে বহুলোকের প্রচেষ্টায়, অথচ হোমিওপ্যাথী, হ্যানিম্যান নামক একজন মাত্র লোকের আবিষ্কার। হ্যানিম্যানের 'অর্গানন' আজ পুরোপুরি অচল। ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া পরিত্যাগ করেছে এই চিকিৎসা পদ্ধতি। সংযুক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতি চালু করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখেন ডঃ মজুমদার। বক্তব্য রাখতে উঠে ডঃ ললিত খাঁড়া তাঁর নিজস্ব চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ তোলেন—আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে দুরারোগ্য কোন রোগ হোমিওপ্যাথীতে নিরাময় হয়েছে, এমন কোন উদাহরণ তাঁর জানা নেই। ওষুধকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে তিনি তিনটি গ্রুপ ভাগ করার কথা বলেন—বিনা ওষুধে আরোগ্য, ওষুধ দিয়ে আরোগ্য আর Placebo অর্থাৎ প্রকৃত ওষুধের নাম করে অন্য কোন নিষ্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে আরোগ্য। সাইকোসোমাটিক রোগের ক্ষেত্রে Placebo দিয়ে কাজ হয়, যেমন হোমিওপ্যাথীতে হয়। ডঃ সমরজিৎ জানা বলেন যে রোগের কারণ জানা দরকার, কিন্তু হোমিওপ্যাথীতে তা করা হয়না। চিকিৎসার এই পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত কিনা, এ বিতর্ক বহু পুরনো; এ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। সামাজিক দিক থেকে সমগ্র হোমিওপ্যাথীকে ধরে নিয়ে আলোচনা দরকার।

আলোচনা-চক্রের শেষে ডঃ জ্ঞান শীল ও ডঃ মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার প্রস্তাব রাখেন, হোমিওপ্যাথী ও অন্যান্য চিকিৎসা-পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে মূল্যায়ন করে একটি সংযুক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতি চালু করার সম্ভবনা বিচারের জন্য একটি কমিটি গঠন করা ব্যাপারে আবেদন করা হোক সরকারের কাছে। সভায় উপস্থিত হোমিওপ্যাথরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন —সারা ভারতের হোমিওপ্যাথদের তরফ থেকে তাঁরা এই বিরোধিতা করছেন। সভায় দেখা যায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। সভাপতি যথেষ্ট চেষ্টা করেন তাঁদের বোঝানোর, কিন্তু তাঁরা নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকেন। এইরকম অচলাবস্থায় প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন ডঃ জ্ঞান শীল। আলোচনা-চক্র শেষ হয় এখানেই।

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলী,

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী—

1980 সালে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা আয়োজিত "হিরোসিমা দিবস" আলোচনাচক্রে আমি মাইক্রোনেশিয়াতে মার্কিন সরকারের পারমাণবিক কার্যকলাপের উপর কিছু তথ্য পেশ করেছিলাম, যেগুলো আপনারা পরবর্তীকালে বি-ও-বি-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর (1980) সংখ্যায় ছাপিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে এই সম্পর্কে রেগান-সরকারের কিছু ভাবনা-চিন্তার কথা "ওয়াশিংটন পোস্ট" পত্রিকা মারফৎ জানতে পারলাম। সেগুলো আপনাদের এবং বি-ও-বি-এর পাঠকদের জানানোর প্রয়োজন আছে মনে করছি।

মাইক্রোনেশিয়া'র কয়েকশত বাসিন্দা তাদের বসবাসের জায়গাগুলোতে পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে সেগুলোকে বাসের অযোগ্য করে তোলার জন্য মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন এবং ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। আজ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ-জনিত যত আবেদন কোর্টে গৃহিত হয়েছে তার পরিমান চার বিলিয়ন ডলার (প্রায় 40 কোটি টাকা)। রেগান সরকার মাইক্রোনেশিয়াবাসিদের আবেদনগুলির ভিত্তি পরীক্ষা করে মাত্র 100 মিলিয়ন ডলার (প্রায় 1 কোটি টাকা) দিতে সম্মত হয়েছেন এবং আবেদনকারীদের এই মর্মে জানিয়েছেন। আগামী অগাস্ট মাসের 17 তারিখে মাইক্রোনেশিয়াবাসিরা এই মার্কিনী প্রস্তাবের উপর আলোচনায় বসবেন এবং ভোট গ্রহণ করবেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে: (1) রঙ্গেলাপ এবং ইউটিরিক দ্বীপগুলোর যে 200 জন বাসিন্দা 1954 সালে একটি 15 মেগাটন পারমাণবিক বোমা বিস্ফারণের ফলে তৈরী তেজস্ক্রীয় "মেঘের" কবলে পড়েছিলেন, তাদের মধ্যে প্রায় 100 জন আজ আজ ক্যান্সার, থাইরয়েড-জনিত বা অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন। (2) বিকিনি দ্বীপপুঞ্জ সেখানকার পারমানবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ হবার প্রায় 20 বছর পর আজও তেজস্ক্রীয়তার ফলে বসবাসের অযোগ্য।

পার্থপ্রতিম মজুমদার
টেক্সাস, আমেরিকা
14 জুন 1982

1 পৃষ্ঠায় 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মোহন' প্রবন্ধের লেখক সৌমেন গুহ

রাতের অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান

অনেকে দিনেই সেরে ফেলছেন

★ এটা ভালোই। অনাবশ্যক আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? বিয়ে বাড়ীতে যেমন আলোকসজ্জা। যৌতুকের চাপে কনের বাপ-মা যখন অস্থির তখন আলোর মালাও বিছের কামড় হয়ে দাঁড়ায়।

★ যৌতুক ও পণপ্রথা সামাজিক কলঙ্ক। তাই এর আদান প্রদান চলে চোখের আড়ালে। এই কুপ্রথা আর আনুষঙ্গিক আড়ম্বর বন্ধ করা দরকার। দেহের জন্য রক্ত যেমন অপরিহার্য, সামাজিক প্রগতির জন্য বিদ্যুৎ-ও তেমনি। এই অত্যাবশ্যক বস্তুটির অপচয় করা অন্যায়।

★ ১৯৮০—৮১-তে আমরা ১১৮·৫ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিলাম। ১৯৮১—৮২-র উৎপাদন লক্ষ্য ১৩০ বিলিয়ন ইউনিট এখনও অনায়ত্ত।

কুপ্রথাগুলিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং দেশের উন্নয়নে প্রয়াসী হওয়া সকলের কর্তব্য

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন—

আমি নতুন বিশ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী। অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা / ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

ডেপুটি ডিরেকটর,
মাস মেলিং ইউনিট,
ডি, এ, ভি, পি,
বি—ব্লক, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ,
নিউ দিল্লী—১১০০০১

নাম.....

ঠিকানা.....

পিন.....

নতুন বিশ দফা কর্মসূচী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
C/o, D. S. Enterprise
52/9C, B. B. Ganguly St. Cal-12
Registration No. R. N. 34929/79 "Registered" Postal Regn. No. WB/CC 113

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পিপল্‌স্ সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন এবং আরো কয়েকটি গনবিজ্ঞান সংগঠন ও বিজ্ঞান ক্লাব যৌথভাবে কিছু কর্মসূচী গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। উৎসাহী সমস্ত সংগঠন ও ব্যক্তিকে যোগাযোগ করতে আহ্বান করা হচ্ছে। প্রথম উদ্যোগ হিসাবে আগামী 6 থেকে 9 আগস্ট 'হিরোসিমা দিবস' উপলক্ষ্যে পরমাণু অস্ত্র বিরোধিতার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। 6 আগস্ট কলকাতায় কেন্দ্রীয় মিছিল ও সমাবেশ, 7 থেকে 9 আগস্ট বিভিন্ন আঞ্চলিক অনুষ্ঠান। 6 আগস্ট মিছিল শুরু কলকাতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে, যাবে শহীদ মিনার।

যোগাযোগের ঠিকানা :

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র

C/o বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
P-23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা—700006
(ফোন : 55-0660)

6 আগষ্ট 'হিরোসিমা দিবসে'র কেন্দ্রীয় মিছিল সফল করুন!

এলাকায় এলাকায় 'হিরোসিমা দিবস' পালন করুন!

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত, রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেসের আর্টিস্টিক্ প্রিন্টার্স, 3/2, আনন্দকুমার রায়চৌধুরী লেন, শিবপুর, হাওড়া—711 102 থেকে মুদ্রিত